[](https://www.facebook.com/NongorGolpo/photos/a.516411805529960/522588481578959/?type=3&eid=ARBHgnFAwzMoUayiPv-EF04giBqf7C46YHJPeFtff3M_VUtb5DNXyQxri2ID0wpOiXlAstKvVH5QrM3E&__xts__%5B0%5D=68.ARCov51sYr_feoU5V_SwbhWf15KGyMuHsGPwU1UVnGBivsIBBRMVlPa91c4Qz3MddkmhVboOfqLYo68UGdQHpT12dpb8ben4j3_8X8NLqwrkmNTlVB3jm-dPVgjC1dTRWdrmZOv0lTDEkytwOCFs8-0ph3_c7XIKvo4fyPA8nzVV3VQcByxqOKeyPigLGCrHtPsGTMtYGgvRwWrtfH16dajYRggqvKVzFPzl2B98ikfZJNrv-FCgU6Y-g4HBPryqdUF0RCXPUJzzY9Htdb92cpcRo_9w08HLEORIwyxDric6DHXCWXg4jTvKqRiC_nJBbyHFBEkvcG9VVm71ncRnVp8&__tn__=EHH-R)

জাপান, সম্ভবত পৃথিবীর সবচে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজড নেশন। খুব অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই হয়তো দ্বিমত করবেন, কেউ কেউ হয়তো জাপান না জার্মানী তা নিয়ে তর্ক করতে পারেন। তবে আমি বলবো জাপান এক, আর জার্মানি দুই।   
.  
খুব খেয়াল করলে দেখবেন, জাপানের লোকসংখ্যা প্রায় দশ কোটির মতন। ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালীর সমতুল্য। কিন্তু জিডিপি বা ওয়েলথ গ্রোথ বিবেচনা করলে জাপান এদের থেকে অনেক এগিয়ে গেছে, অনেক আগেই।

.

জাপান এমন লিজেন্ডারী লেভেলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রডাকশনকে নিয়ে গেছে, যে দুনিয়ার কোন শক্তিই তার সমকক্ষ না। দুনিয়ার সেরা সব ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীই কিন্তু জাপানের, কারন তার মত কোয়ালীটি পণ্য কেউ বানাতে পারেনা আর কেউ। ইভেন আমেরিকান ব্রান্ডগুলোকেও জাপান মার খাইয়ে দিয়েছে, আর ইউরোপ তো নস্যি।

.

যে কারণে ১৯৯৫ সালেই জাপানের জিডিপি (=বাৎসরিক সম্পদ উৎপাদন) ৫.৫ ট্রিলিয়ন ডলার হয়ে যায়, অথচ তখন জার্মানীর জিডিপি ছিল ২.৫ ট্রিলিয়ন, আর ইউকে-ফ্রান্স-ইটালীর ছিল ১ থেকে দেড় ট্রিলিয়ন। তাহলে বুঝেন জাপান কত ধনী, আর কত সম্পদ উৎপাদন করে বছরে , অন্যদের তুলনায়। যদিও ১৯৪৫ সালেই দেশটি ছিল পারমানবিক বোমায় আক্রান্ত এক বধ্যভূমি। সমসাময়িক সময়ে পাকিস্তান-ভারত বা বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও আজ আমাদের জিডিপি ইভেন ১ ট্রিলিয়ন ছোঁয় নি। বাংলাদেশ মাত্র ০.২০ ট্রিলিয়ন , দু:খ।

.

অথচ জনসংখ্যায় জাপান আমাদের প্রায় অর্ধেক। ইন্ডিয়ার পনেরোভাগের এক ভাগ।   
পুরো মুসলিম উম্মাহর ৫৭ টা দেশের জিডিপি যোগ করে দেখলাম ৪.০ ট্রিলিয়নের কাছাকাছি হয়। অথচ জাপান একাই ৫.৫ ট্রিলিয়ন, সেই ১৯৯৫ সালেই। চিন্তা করেন , দু:খ রাখবো কোথায়।

.

কথা সেটা না। কথা হল এই উন্নতির কারণ নিয়ে আগে লিখেছিলাম। একটু রিমাইন্ড করি। জাপানীরা খুব সৎ , খুব কর্মে মনোযোগী, খুব লীন সিক্স সিগমা করে, ফাইভ এস-পোকা ইয়োকা-কাইজেন-ডামাভি : এইসব করে, দিনে ১৬ ঘন্টা কাজ করে , খুব টাইম ম্যানেজমেন্ট করে চলে, আমাদের মতন সময় নষ্ট করেনা, কোন দুর্নীতি নেই, দুই নম্বরী নেই \_\_\_ এসব হল তাদের উন্নতির কারণ।

.

সুতরাং, এসব শুনে আমাদের মনে একটি প্রশ্ন জেগেছিল। তা হল, যদি জাপান যদি এসব লীন সিগমা করে এত উন্নতি করে, তাহলে আমাদের ইসলামের দরকার কি? আমরাও লীন সিগমা করি, তাহলেই তো যথেষ্ঠ? তাহলে আল্লাহ এই ইসলামকে কেন দিলেন?

.

তার উত্তরই এই পোস্টে দিতে যাচ্ছি। কারন তা একটি সেপারেট পোস্ট ডিসার্ভ করে।  
.

খুব ভাল করে যদি জাপান সংক্রান্ত নিউজগুলো ইদানীং শুনে থাকেন, খেয়াল করবেন, যে জাপান একটা বড় ধরনের বিপদের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। সেটা হল, তাদের জনসংখ্যার একটি বড় অংশ বৃদ্ধ এবং যুবক বা শিশুদের সংখ্যা সিগনিফিক্যান্টলী কম। মানে খুবই কম।   
.

জাপানে নতুন নতুন জাপানী বাচ্চা জন্ম নিচ্ছে না। কিন্তু আগেকার বুড়োরা রয়ে গেছে। কাজেই একটি বিষম অসাম্যবস্থা তৈরী হচ্ছে। সংখ্যানুপাতে শিশু-যুবক-তরুন কমে গেছে অনেক, কিন্তু চল্লিশোর্ধ মানুষ সংখ্যায় বেড়ে গেছে অনেক।

.

জনসংখ্যা কমে যাচ্ছে জাপানে, কোন জন্মনিয়ন্ত্রণ ছাড়াই। এই মুহূর্তে জাপানের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ''নেগেটিভ ০.২%'' । এই হারে চললে আর শ খানেক বছর পর ( বা তার আগেই হতে পারে ) জাপানী জাতি পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এন্ডেনজারড স্পীশিজ হতে যাচ্ছে জাপানীরা। ইভেন জার্মানীরও একই অবস্থা।

.

এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে যদি একটু রিসার্চ করেন, তাহলে খুজে পাবেন এর উৎস কোথায়।

আসলে ১৯৪৫ এর পর আমেরিকা জাপানকে অধিকারে নিয়ে নেয়। এরপর জাপানে সেই পশ্চিমা সভ্যতার সব আইডিওলজীর চাষ হয়। জাপানীরা আবার খুব সিরিয়াস পিপল। যেটা করে, খুব জান দিয়ে করে। ইভেন পশ্চিমারাও এত সিরিয়াস না।

.  
তো আগে জাপানী নারীরা মুসলিম নারীদের মতই ঘরে থাকতো, ঘর-সংসার করতো। কিন্তু পশ্চিমা ফেমিনিজমের প্রভাবে জাপানী নারীরা পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজে নেমে পড়ে, কারণ তাকে পুরুষের সমান হতে হবে। পুরুষ বাহিরে কাজ করে, সে কেন ঘরে বসে বাচ্চা পালবে? বাচ্চা পালা কি একটা কাজ হল? বাচ্চা মরলে মরুক, আগে ক্যারিয়ার।

.

কাজেই জাপানী নারীরা মূল ওয়ার্ক ফোর্সে জয়েন করে। নারী-পুরুষ কোন ভেদাভেদ নেই এখন। সত্যিকারে ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশনকে শতভাগ ফলো করলো জাপান, যেটা ইভেন ওয়েস্টার্নার রা নিজেরাও করেনা।

.

সে কারণে এখন জাপানে সব নারীই উচ্চ শিক্ষার পরপর বিয়ে করেনা। সুন্দরী এট্রাকটিভ মেয়েরাই বিভিন্ন করপোরেটে জয়েন করে, নিজের ক্যারিয়ার গড়ে, আর বাচ্চা পালা বা বিয়ে করাকে কে একটা বাজে কাজ মনে করে। নিম্ন মানের কাজ।

.

বিয়ে করলে বাচ্চা হবে, কাজের ক্ষতি হবে। আর বৈবাহিক জীবনে সময় দিতে গিয়ে ক্যারিয়ারও ঠিকমতন হবেনা। আর ওদিকে পুরুষ তো এগিয়ে যাচ্ছে, কাজেই তাকেও ধরতে হবে। সুতরাং , জাপানী নারীদের সহজ সমাধান হল: নো বিয়ে, নো বাচ্চা, অনলী ক্যারিয়ার। ক্যারিয়ার গড়তে গড়তে ৩৫ বছর, কাজেই পরে আর বিয়ের বয়সও নেই। কাজেই কোন বিয়ে না করেই জীবন পার করে দিচ্ছেন জাপানী নারী রা। জনসংখ্যার বিশাল অংশ।

.

সুতরাং বিয়ের জন্য পুরুষরা চাইলেও নারীরা এভেইল্যাবল না। পুরুষদের তো বিশাল অসুবিধা আছে, বিয়ে না করলে অনেক সমস্যা আপনারা জানেন। কিন্তু নারীদের তো কথা বলার লোক থাকলেই মোটামুটি হয় মনে হয়, সেটা তো চাকরিতে জয়েন করলেই অনেক বন্ধু বান্ধব পাচ্ছেন?? কি জানি আল্লাহ ভাল জানেন। এক্সপ্লেইন করতে চেষ্টা করলাম, সিস্টার রা মাইন্ড কইরেন না।   
.  
তাহলে জাপানী পুরুষরা নিজেদের চাহিদা মিটাচ্ছেন কিভাবে? সেজন্য পশ্চিমা বিশ্ব তাদেরকে বিশেষ থেরাপী দিয়ে দিয়েছেন। পর্ণ সবজায়গায় এভেইলেবল, কাজেই পর্ণ দেখে অবৈধভাবে নিজেকে রিলাক্স করে নিচ্ছেন জাপানী পুরুষরা, কি করবে ? মেয়েরা বিয়ে করতে চায়না যে? চিটাগাং এর ভাইরা আওয়াজ দিয়েন।

.

কিছু কিছু জাপানী পুরুষ এক কাঠি সরেষ!!! তাদের জন্য আবার এক বিশাল সেক্স ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠেছে জাপানে, সেখানে গিয়ে তারা কিছুক্ষণ প্লেটোনিক লাভ করে চলে আসবেন , বিনিময়ে টাকা দিবেন কিছু। আসতাগফিরুল্লাহ।   
.

তো এই অতি ফেমিনিজম হল এক নাম্বার কারণ, যে কারণে জাপানে জনসংখ্যা কমে যাচ্ছে।

.

কিন্তু এটাই একমাত্র কারণ নয়, বরং আরও একটি কারণ আছে, সেটাতে আলোকপাত না করলে ইনসাফ হবেনা। সেটা হল, জাপানে থাকা অতিরিক্ত কাজ করার কালচার।

.

জাপানী প্রতিটা করপোরেটে অতি প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে তারা মাত্র ৮-১০ ঘন্টা কাজে সন্তুষ্ট না। ১৪-১৬-১৮ ঘন্টা কাজ জাপানে খুব নরমাল। সকাল ৮ টা থেকে রাত দশটা খুব নরমাল। আগে সাপ্তাহিক ছুটিও ছিলনা, যদিও এখন সেটা করেছে।

.

যেখানে ইউরোপ আমেরিকাতেও মানুষ বিকাল ৫ টার পর অফিসে থাকেনা, সেখানে একজন এভারেজ জাপানী রাত দশটা বাজে বাসায় যায়। আর জাপানীরা না মুসলমান, না খ্রিস্টান, না হিন্দু। কাজেই তাদের ঈদ ও নাই, পূজাও নাই, ক্রিস্টমাসও নাই। বাৎসরিক তেমন কোন ছুটি নাই।

সুতরাং জাপানীরা সারা বছর মোটামুটি শুধু কাজই করে, কোন সামার নাই, বা বড় কোন ছুটিও নাই।

.

একটা মানুষ যদি এত কাজ করে, তাহলে কি হয়? যেটা হয়, সেটা হল, সে ফ্যামিলী রিলেশন মেইন্টেইন করতে পারে না, ফ্রেন্ডদের সাথে রিলেশন মেইন্টেইন করতে পারেনা। কোন সোস্যাল গ্যদারিং না থাকায়, জাপানীরা একে অন্যের সাথে পরিচয়ও হয়না, সামাজিক রিলেশনগুলোও গড়ে উঠেনা। তার উপর মহিলারাও পুরুষদের মতন অফিসে থাকে, কাজেই সামাজিক কোন অনুষ্ঠানও বিরল। এগুলো এরেঞ্জ করবে কে?

.

কাজেই জাপানীরা রোবোট হয়ে যায়। সারা বছর কাজ করে চলেছে, কারো সাথে কারো যোগাযোগ নেই। একদম সত্যিকারের রোবট।

আপনি যে বিয়ের জন্য কাউকে খুজবেন, কিভাবে খুজবেন, আপনি তো কাউকে চিনেন না, কেউ আপনাকে চিনেনা। আপনার কোন বন্ধু ও নেই। একই অবস্থা আপনার হবু বউ এরও। সুতরাং বিয়ে হবে কিভাবে?

.

আজ জাপানের ১৮-৩৪ বছর বয়স্ক প্রায় ৫০ ভাগ পুরুষ ও নারী ভার্জিন। বিয়েও করেনি, একা একা চলছে।   
৫০ বছর বয়স্ক শতকরা ২৫ ভাগ পুরুষ এখনও অবিবাহিত। চিন্তা করতে পারেন। চিন্তা করতে পারেন, কি হতে যাচ্ছে দেশটিতে?   
.  
‌এখন চিন্তা করুন, আল্লাহ কি আমাদের রোবোট করে বানিয়েছেন? আমরা কি রোবোট? আমরা তো রোবোট নই।

.

আমাদের আবেগ আছে, ভালবাসা আছে, কথা চিন্তা শেয়ার করার শক্তি আছে, এবং এগুলো আমাদের জীবনের অংশ। এগুলো নিয়েই আমাদের সমাজ গড়ে উঠে। দুনিয়ার সব জায়গায়। এই সমাজকে বাদ দিয়ে চলতে গেলে আপনি চলতেই পারবেন না, এটা হিউম্যান জেনেটিক্স এর মধ্যে ডিজাইন্ড।

.

সুতরাং হিউম্যান ওয়ে অব লাইফ এমন হতে হবে, যা তার জেনেটিক্স এর সাথে সংগতি পূর্ণ, তার ফিতরাত এর সাথে সংগতি পূর্ণ। যদি এর বিপরীত 'ওয়ে অব লাইফ' সে ফলো করে, সে শর্ট টার্মে লাভবান হলেও লং টার্মে ধ্বংস হয়ে যাবে, সে হয়তো হবে সত্যিকারের অসুখী।

.

এই ব্যাপারটাই জাপান বুঝেনি, তারা ওয়াহীর জ্ঞান পায়নি। কারণ ওয়াহি দিয়ে মানুষকে তার 'ওয়ে অব লাইফ' টি জানিয়ে দেয়া হয়েছে। নিজের মাথা খাটিয়ে 'ওয়ে অব লাইফ' বের করার ক্ষমতাই তাকে দেয়া হয়নি।

.

চিন্তা করেন, যদি জাপানীরা মুসলিম হতো, তাহলে তাদেরকে দিনে ৫ বার নামাজ পড়তে হতো। সুতরাং এত দীর্ঘক্ষণ তাকে কাজ করতে হতোনা। কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাকে বিশ্রাম নিতে আল্লাহ বাধ্য করতেন। এশার নামাজের এক্সকিউজে সে রাত দশটার বহু আগেই কাজ শেষ করতে পারতো, তাকে ফজরের জন্য উঠতে হবেনা? সে সপ্তাহে একটা ছুটি তো পেতোই, বছরে তার জন্য দুইটা বড় ছুটি ঈদুল আযহা আর ঈদুল ফিতর থাকতো।

.

সে একটু রিলাক্স হতো, সে একটু সামাজিক হতো, কারণ দুই ঈদের তার সব বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের সাথে তার দেখা হতো। সবাই তাকে বিয়ের প্রেসার দিতো, সেও ভিতর থেকে ফীল করতো । আর পর্ণ দেখে রিলাক্স হবার কোন অপশন ইসলাম রাখেনি। কাজেই বিয়ের জন্য সে ডেসপারেট হতো।

.

তার উপর জাপানী মেয়েরা নিশ্চয়ই পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে ৩৫ বছর পর্যন্ত ওয়েট করতোনা। নিশ্চয়ই মাতৃত্ব তাদের অনেক ডিয়ার এবং নিয়ার হতো। একদল নতুন মুসলিম পিচ্চি পুচ্চী কে দুনিয়ায় বড় করার বাসনা নিশ্চয়ই তাকে তাড়িয়ে বেড়াতো। এক ইমার্জেন্সী না হলে, সে নিশ্চয়ই ক্যারিয়ার গড়ার জন্য পিচ্চি পুচ্চীদের আগমনকে থামিয়ে রাখতোনা।

.

কাজেই জাপানী ছেলেরা তখন জাপানী মেয়েদের বিয়ে করতো, কারণ ছেলেরাও বিয়ে করতে চায়, মেয়েরাও এভেইলেবল। হয়তো টাকা উপার্জন একটু কম হতো। না হয় ৫.৫ ট্রিলিয়ন না হয়ে ২.৭৫ ট্রিলিয়ন হতো বাৎসরিক জিডিপি, সমস্যা কোথায়? তাও তো জার্মানী থেকে বেশী, ইউকে থেকে বেশী, ফ্রান্স থেকে বেশী, তাইনা? এত টাকা দিয়ে করবেটা কি? বাংলাদেশী টাকায় এভারেজে তারপরেও মাসে ৩ লাখ পায়। একটা পরিবার চালানোর জন্য তো যথেষ্ঠ? তাইনা?

.

তখনই জাপানীরা হতো সত্যিকারের সুখী। আমরাও পেতাম পিচ্চী পুচ্চি কিউট কিউট জাপানী মুসলিম বাবু। যদিও এখনই তা হতে যাচ্ছে না। দু:খ। আজ জাপানে বড় অংশের জনসংখ্যা এতই অশান্তিতে বড় হচ্ছে যে বছরে ৫০ হাজার ডলার এর বেশী ইনকাম করেও আত্মহত্যা করে মারা যাচ্ছে। মানবসম্পদের কি অপচয়!!!!

.

কিন্তু প্রশ্ন হল, একই সমস্যায় ইউরোপ-আমেরিকা কেন আক্রান্ত হয়নি। কারণ জাপান তো তাদের লাইফস্টাইল ফলো করতেছে।

.

উত্তর হল, ইউরোপ - আমেরিকানরা নিজেরাও এরকম সিরিয়াসলী তাদের থিউরিটিকাল লাইফস্টাইল ফলো করেনা। আর তারা কালচারালী খ্রিস্টান হওয়ায়, তাদের একটা বড় অংশ এখনও খ্রিস্টধর্মকে ফলো করে। দেশে দেশে ডানপন্থী রাজনীতির উত্থান দেখেই তো বুঝা যায়।

.

আর আমেরিকানরা এখনও তাদের ইউরোপীয়ান কাউন্টারপার্টদের থেকে অনেক বেশী ধার্মিক। হলিউডের মতন লাইফস্টাইল আপনি অনেক জায়গাতেই পাবেন না। গোঁড়া খ্রিস্টান, গাদা গাদা বাচ্চা সহ অজস্র পরিবার আমেরিকেতই আছে।

.

এখানে আমেরিকায় অনেক মেয়েই বাচ্চা পালার জন্য চাকরি ছেড়ে দেয়। অনেকে মেয়েই চাকরিই করেনা, কারণ বাচ্চা হয়ে গেলে আর সময় পায়না। এখানে আসলে হরেক রকমের মানুষ পাওয়া যায়।

.

যদিও জাপানীরা সেটা বুঝেনি। তারা থিউরী পড়েই ডাইরেক্ট গণহারে তা ইম্প্লীমেন্ট করতে গিয়েছে। তাতেই বিধিবাম। আজ তারা পৃথিবীর সবচে অসুখী জাতি হয়তো। না হলে তারা আত্মহত্যায় তারা এত উপরে কেন ? দিনে প্রায় ৭০ জন জাপানী আত্মহত্যা করে মারা যায়।

.

অথচ একটা ছাপড়া ঘরে থেকে দিনে ১০০ টাকা ইনকাম নিয়ে কাচা মরিচ দিয়ে ভাত খেয়ে লুঙ্গি কাচা দিয়ে ঘুমিয়ে বাংলার রিকসাওয়ালারা কত সুখী? চিন্তা করেন? এজন্য দিনে মাত্র ১ জন বাঙ্গাললীও আত্মহত্যা করলে দেশে নিউজ হয়, অথচ জাপানে এটা একটা পানিভাত ব্যাপার। প্রতিদিনই হচ্ছে, এখানে ওখানে।

.

একই সমস্যা কিন্তু জার্মানীতেও হয়েছে। কারণ একটাই, জার্মানরা জাপানীদের মতন একটু কাজ পাগল এবং এরা একটু ধর্মহীন , এবং মাত্রাতিরিক্ত ফেমিনিজম আক্রান্ত।

.

আসলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকানদের বুদ্ধিতে জার্মান আর জাপানীরা মাত্রাতিরিক্ত কাজ- ফেমিনিজম-ধর্মহীনতার এই পশ্চিমা লাইফস্টাইলে সিরিয়াসলী অভ্যস্ত হয়, বা বলতে পারেন বাধ্য করা হয়: মিডিয়ার মাধ্যমে। তার ফলশ্রূতি আজকের জাপান বা জার্মানী।

.

এভাবে চলতে থাকলে, জাপান বা জার্মানী একদিন জনমানবহীন ধূধূ প্রান্তরে পরিণত হবে, আর কিছু নয়, এটিমিক বোম তাদের ধ্বংস করতে পারেনি, কিন্তু ওয়েস্টার্ন লাইফস্টাইফ তাদের ধ্বংস করে দিচ্ছে, চিন্তা করতে পারেন? আল্লাহ না করুক। আসুন দোয়া করি, যাতে আল্লাহ এই জাতি দুটোকে ইসলাম দ্বারা রক্ষা করেন।

.

তাহলে চিন্তা করুন, আসলে জাপানের এই ৫ ট্রিলিয়ন ইকোনমি, এত লীন সিক্স সিগমা, এত সততার গল্প, সবকিছুই বৃথা, কারণ সে তো জাতিগতভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, আর পারসোনাল লাইফে সে এত অসুখী যে আত্মহত্যা করতে হয়।   
.  
কোন পরিবার নেই, কোন ফ্যামিলী রিলেশন নেই, কোন বন্ধু নেই, কথা বলার একটা লোক নেই, শুধু কাজ আর কাজ। এরকম একটা দম বদ্ধ পরিবেশে থেএকে জাপানীরা হয়তো খুব সুন্দর সুন্দর ছবি ফেবুতে শেয়ার দেয়, আর তা দেখে সবাই ভাবে, যে তার বুঝি খুব ভাল আছে।

.

অথচ আত্মহত্যা রেইট দেখেই বুঝা যায়, যে তারা কত অসুখী। কারণ কিন্তু একটাই। সেটা হল, ওয়াহীর জ্ঞান না পাওয়া। আল্লাহ কে না চিনা, রসূল(স) এর সীরাতকে না জানা। শুধু দুনিয়া নিয়ে থাকা, নিজের মাথা খাটিয়ে 'ওয়ে অব লাইফ' / 'লাইফস্টাইল' কে বানাতে চেষ্টা করা। শুধুই ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের বাহিরে আর কিছু চিন্তা করতে না পারা।   
.

তাহলে দেখুন, ইসলাম কিভাবে আদম থেকে আসা সব গোত্রের মানুষকে ব্যালেন্স করে। যারা এই লেখাটা জাপানী ভাষায় অনুবাদ না করলে পড়তে পারবেনা, তাদের অতি-কাজ,অতি-ফেমিনিজম করার পাগলামী থামিয়ে তাদের সামাজিক মানুষ বানায়।

.  
আর যারা মাতৃভাষায় এই লেখাটা পড়তে পারছে, তাদেরকে ইসলাম কিছুটা পরিশ্রম করে ভুড়ি কমিয়ে কাজ করে সততা মেইন্টেইন করিয়ে ব্যালেন্স করে। কারণ তারা একটু অলস ফিতরাতের উপর জন্ম নিয়েছেন, লেখকের মতন।

.

পুনশ্চ: লীন সিক্স সিগমা-টাইম ম্যানেজমেন্ট : এসবের দরকার আছে, সাইন্স টেকনোলজীরও দরকার আছে। কিন্তু তা কাজ করবে তখন, যখন লাইফস্টাইল/ ওয়ে অব লাইফ হিসেবে আপনি ইসলামকে বেইজ হিসেবে মানবেন।   
যদি তা না মানেন, তাহলে সবই বৃথা। কয়েক জেনারেশন পরেই আপনার অস্তিত্ব থাকবেনা, জাস্ট নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন। আর সবাই হবেন অসুখী।

সুতরাং আমরা ইসলামের উপর থেকেই ভাল আছি। ওইসব লীন সিক্স সিগমা-সাইন্স-টেকনোলজী হবে পরে। কিন্তু ফাউন্ডেশনে ইসলাম আনতে হবে আগে।   
তাহলেই হবে শান্তি, সুখ আর সফলতা। কি দুনিয়ায়, কি আখিরাতে। আল্লাহ যেন ইসলাম দ্বারা জাপানী আর জার্মানীদের রক্ষা করেন। আমীন।



মানুষ বাকি সৃষ্টি থেকে শ্রেষ্ঠ শুধুমাত্র চিন্তাশীল একটা মগজের কারণে। শারীরিকভাবে মারাত্মক দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও পুরো পৃথিবীতে চলছে মানুষের রাজত্ব। এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী অবস্থানের কারণে মানব জাতির মস্তিষ্কে এটা গেথে গেছে যে মানুষ বুদ্ধিমত্তায় অসীম। এর মানে হলো মানুষ মনে করে, সে যা চিন্তা করে তার বাইরে তার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কোনো চিন্তা নেই। এই কারণে মানব মস্তিস্ক প্রসূত ধারণার বাইরে যেকোনো কিছু অস্বাভাবিক লাগে, অবাস্তব লাগে। সঙ্গত কারণে অন্য কোনো সুপার বিয়িং বা এনটিটি থেকে আসা মেসেজ মানুষ তার নিজের মস্তিষ্কের ফিল্টারে ঢুকিয়ে নিজেকে স্ট্যান্ডার্ড ধরে তারপর বিবেচনা করে। মানুষ এটা বিশ্বাসই করতে চায়না তার মস্তিষ্কের চিন্তারও একটা লিমিট আছে। আর এই কারণেই মানুষ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার অ্যাকশন ও এট্রিবিউটগুলো নিজের ফিল্টারে ঢুকিয়ে তারপর ডিসিশন নেয়, মস্তিষ্কের ফিল্টারে উত্তীর্ণ হলে মেনে নেয়, অন্যথায় অস্বীকার করে বসে। মুমিনদের অধিকাংশ মস্তিষ্কের সাথে দ্বিমতপোষণকারী বিষয়গুলো মানতে মনের সাথে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে।  
.

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার অ্যাকশন ও এট্রিবিউট গুলো কেনো মস্তিষ্কের ফিল্টারে ঢুকানো যাবে না তার কিছু উদাহরণ দেই। ইবলিশ যখন ফেরেস্তা ও আদমের সামনে আল্লাহর অবাধ্যতা করলো, ইবলিশকে অভিশপ্ত ঘোষণা করা হলো, আল্লাহ ক্রোধান্বিত হলেন ইবলিশের উপর, ঠিক তখনি ইবলিশ কিছু দাবি দাওয়া পেশ করে বসলো, দাবিগুলোর উদ্দেশ্য আল্লাহর সাথে চ্যালেঞ্জে জয়ী হওয়া এবং সবগুলো দাবিই পূরণ করা হলো।  
.  
এবার মানুষের মস্তিষ্কের ফিল্টারে যদি এই ঘটনা ঢুকাই তাহলে কি দাঁড়ায় সেটা দেখা যাক। একটা চাকর দীর্ঘদিন ধরে আপনার বাড়িতে কাজ করছে, একদিন আপনার বাড়িতে কিছু গন্যমান্য মানুষের উপস্থিতিতে আপনার একটা গুরুত্বপূর্ণ আদেশ অমান্য করে বসলো। আপনার অবস্থা একটু কল্পনা করুন। লজ্জায় মাথা হেট হয়ে যাবে, হয়তো মারধর ও শুরু করে দিতে পারেন সাথে সাথে, ন্যূনতম শাস্তি হলো সাথে সাথে চাকরিচ্যুত। এরপরের ব্যাপারটা আরো কঠিন। সেই চাকর যদি আপনাকে বলে ঠিক আছে আমি চলে যাচ্ছি, আমাকে এমন কিছু জিনিস প্রদান করুন (যেমন: টাকা পয়সা, লোক লস্কর ইত্যাদি) যাতে আমার সক্ষমতা কিছু বাড়ে এবং পরবর্তীতে আপনি যে আমাকে চাকরিচ্যুত করলেন এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারি। চাকরের এই আবদার পূরণের পক্ষে কি পৃথিবীর কোনো মস্তিষ্ক সায় দিতে পারে? অবশ্যই পারে না, মস্তিস্ক আপনাকে বলবে, এর থেকে অবাস্তব আবদার আর হতে পারে না। ঠিক, এটাই হলো আমাদের মস্তিষ্কের সীমাবদ্ধতা, যেই সীমাবদ্ধতার কারণে চাকরটির আবদার মেনে নেয়া যে সম্ভব, এটা মস্তিষ্কের চিন্তার বাইরে।  
.  
আরেকটা উদাহরণ দেই। ধরুন একটা লোককে আপনি বললেন তুমি যদি আমাকে অল্প কিছু টাকা (১০০-২০০) দাও তাহলে পঞ্চাশ বছর পরে তোমার উপরে মারাত্মক একটা বিপদ আসবে তখন আমি তোমাকে এই ১০০-২০০ টাকার বিনিময়ে ওই বিপদ থেকে উদ্ধার করবো। লোকটি বিষয়টি গুরুত্ব দিলো না, আপনাকে ইগনর করলো। কিন্তু দেখা গেলো ৫০ বছর পরে সেই মহাবিপদটি এসে উপস্থিত। লোকটি তখন বিপদ দেখে আপনার দাবি দাওয়া না থাকা সত্ত্বেও আপনাকে ১ বিলিয়ন ডলার দিয়ে বললো আপনি আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করুন। লোকটির কাছে মহাবিপদ হলেও আপনার কাছে লোকটিকে বিপদটা থেকে উদ্ধার করা এক গ্লাস পানি খাওয়ার চেয়েও সহজ। আপনার মস্তিস্ক এখানে যেসব চিন্তা করবে তাহলো-

(১) আপনি যদি লোভী হন তাহলে পুরো ১ বিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে লোকটিকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন।

(২) আপনি যদি সৎ হোন হয়তো অল্প কিছু টাকার বিনিময়ে লোকটিকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন।

(৩) আপনি যদি দুর্দান্ত সৎ হোন তাহলে টাকা ছাড়াই লোকটিকে বিপদমুক্ত করবেন। আপনি লোকটির কাছ থেকে টাকাও নিবেন না আবার মহা ভয়ঙ্কর বিপদ থেকেও মুক্তি দিবেন না, এই চিন্তা করা কি সম্ভব? আপনার মস্তিস্ক কস্মিনকালেও এই কাজটি করার পক্ষে সায় দিবে না। অর্থাৎ উপরে উল্লেখিত ৩টি চিন্তা ছাড়া অন্য যেকোনো চিন্তা আপনার মস্তিষ্ক প্রত্যাখ্যান করবে বাস্তবতা বিবর্জিত বলে।  
.

এবার দেখুন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বললেন, তোমরা যদি দুনিয়াতে একটু কাঁদো আমার ভয়ে তাহলে আখিরাতে ভয়ঙ্কর জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবো। আপনি এটাকে ইগনোর করলেন, ভাবলেন এসব হয়তো মিথ্যা (নাউযুবিল্লাহ)। আল্লাহর কথা মতো আল্লাহর ভয়ে একটুও কাঁদলেন না। হটাৎ মৃত্যু, আখিরাত এসে গেলো জাহান্নাম আপনার সামনে। আপনি এখন কাঁদতেছেন, কলিজা ফাটা কান্না, চোখ দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে , আল্লাহর কাছে জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাইছেন। আল্লাহ আপনার আখিরাতের কাঁন্নার কোনো মূল্য দিবেন না, তা আপনি যতই কাঁদেন অথচ আপনাকে জাহান্নাম থেকে জান্নাতে প্রবেশ করালে আল্লাহর কোনোই ক্ষতি বা লাভ নেই তারপরেও আপনার গগনবিদারী কান্নার কোনো মূল্য থাকবে না সেইদিন। অথচ দুনিয়াতে মাছির মাথার মতো কাঁদলে নিস্তার পেতেন, আর আখিরাতে কেঁদে কেঁদে কলিজা ছিঁড়ে ফেলেও লাভ হবে না। কি আমাদের মস্তিস্ক কি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা র এই পদ্ধতিটা বুঝতে সক্ষম? স্বাভাবিক মস্তিষ্ক এটা মানতে পারবে না, কোনো যুক্তিই দাঁড় করাতে পারবে না। এখানেই মস্তিষ্কের সীমাবদ্ধতা।   
.  
আমরা মনে করি আমাদের চিন্তার বাইরে আর কিছু নেই।  
মূলত এই ভাবনাটাই নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। মানুষ নিজেকে বিশাল কিছু মনে করে অথচ মহাকালের কাছে মানুষ বালুকণার মতো। মানুষ তার নিজের অস্তিত্বের আগে এই মহাজগতের অবস্থা কেমন ছিল তা বলতে পারে না, আবার তার অস্তিত্ব শেষ হয়ে যাওয়ার পরে এই মহাবিশ্বের কি হবে তাও বলতে পারবে না।   
মানুষ হলো সেই অসীম সময়ের স্কেলের একটা ক্ষুদ্র দাগের থেকেও ক্ষুদ্র যেই স্কেলের শুরুর ও শেষের কোনো প্রান্ত নেই। ক্ষুদ্র একটা টাইম ফ্রেমে মানুষের আনাগোনা। মানুষ সেই সত্তার সাথে লড়তে চায় যিনি তার সৃষ্টির পূর্বেও ছিলেন, এখনো আছেন এবং ভবিষতেও থাকবেন, আর ক্ষুদ্র মানব জাতি হয় জাহান্নামে অথবা জান্নাতে থাকবে। তারা কখনোই জানতে পারবে না মহামহিময় তখন কি করছেন, তার বাকি সৃষ্টির ভাগ্যে কি জুটেছে, সামনের অনন্ত সময়ে কি ঘটবে?

মানুষ, কি যে তুচ্ছ, কি যে নির্বোধ এক সৃষ্টি!!

ক.

ভালোবাসা।

অন্তরের জ্বালানি। মনের শান্ত কুটিরের খুঁটি।  
মানুষ যদি মানুষকে ভালোবাসতে না পারে, তবে মনের কুটিরটা ধসে পড়ে। খাঁ-খাঁ করে। তাতে জন্ম নেয় তপ্ত মরুভূমি।

ভাবা যায়? এ পৃথিবীতে কেউ কাউকে ভালোবাসে না! মা সন্তানকে ভালোবসে না! ছেলে বাবাকে ভালোবাসে না! ভাই ভাইকে ভালোবাসে না! সে এক জগৎ বটে! এমন জগৎ কি সম্ভব? নাহ। সম্ভব না। ভালোবাসাই বাবাকে সেই ভোরে কনকনে শীতে গতর খাটতে ঠেলে বের করে। ভালোবাসা টেনে ধরে আহ্লাদি কন্যা থেকে সদ্য মাতৃত্বে প্রবেশ করা মেয়েটির দুই চোখ; সারারাত; ক্রন্দনরত সন্তানের জন্যে।

ঐ যে সেই কবে ছেলেটি সকাল বেলা নামাজ পড়ে বাসায় ফিরে ষোড়শী স্ত্রীর জন্য এক হাত তাজা শিউলি ফুল কুড়িয়ে এনেছিলো, সে কি ভালোবাসা ছিলো না? সেই মুঠোভরা ফুলের সুবাসে অন্তর মৌ মৌ করেছিলো মেয়েটির। সেদিন আনন্দে আটখানা হয়ে কাঁচা হাতে বর সাহেবের জন্য রান্না পাকিয়েছিলো সে। নাকে মুখে ধোঁয়া টেনে। ভালোবাসাই তো ছিল!  
এই তো ভালোবাসা। বেঁচে থাকার সমার্থক। এই তো সেই ভালোবাসা, যা কাছে টানবেই। উদ্বেলে হাসাবেই। আবেগে কাঁদাবেই।  
.

খ.

আরশের ওপর যিনি আছেন, তিনিও ভালোবাসেন। অনেক। ভালোবাসা তাঁর এক অনন্য গুণ। প্রচন্ড সে ভালোবাসা। প্রগাঢ় সে মমতা। ‘ধ্যাৎ! আল্লা-খোদা কিস্যু নাই” - বলে মহাবিশ্বের একক অধিপতিকে বুড়ো আঙ্গুল দেখানো আধুনিক তরুণটিও বুক ভরে শ্বাস নেয় ধরার বুকে। মা-বাবার স্নেহের আদরে লালিত হয় আমৃত্যু। বিত্তের অভাব কখনো স্পর্শ করে না। ক্ষুধায় অন্ত্র জ্বলে না। পরম মমতায় তাকেও অক্সিজেনের কোন অভাব হতে দেন না ঐ দয়াময়। ভালোবাসা কাকে বলে?  
.  
মানুষও দাবি করে তারা দয়াময়কে ভালোবাসে। অনেকেই। খুব ভালোবাসে। চোখ মেলে দেখলেই অনেক মিলবে। দাবি। কারো সত্য, কারো মিথ্যে।  
দয়াময় আল্লাহ তাঁর কথাতেই বলছেন,

“মুহাম্মাদ! তুমি বলো, যে তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমাকে অনুসরণ করো। তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন, তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল আর দয়াময়।”  
[সূরা আলি ইমরান, আয়াত ৩১]  
.  
দু-দন্ড ভাবি। দয়াময় আল্লাহ তাঁর প্রেরিত রাসূলকে ﷺ আদেশ করছেন যেন তিনি সবাইকে বলে দেন যে আল্লাহকে ভালোবাসার দাবি যে করবে, সে যেন মুহাম্মাদকে ﷺ অনুসরণ করে। তবেই না আল্লাহও তাকে ভালোবাসবেন। গুনাহ মাফ করবেন।  
ছাকনি। আটকে যাই অনেকেই।  
.

গ.

“ভালোবাসি। ভালোবাসি। এই সুরে, কাছে-দূরে, জলে-স্থলে বাজায় বাঁশি। ভালোবাসি।”  
.  
জলে-স্থলে ভালোবাসা দেখেছিলেন কবিগুরু। অসত্য কী? নাহ। মোটেই না। ভালোবাসা তো আজ বাতাসেও। ইংরেজরা বলেছে, Love is in the air. বেতার তরঙ্গে আজ কত ভালোবাসা! গোপনে, প্রকাশ্যে। ভালোবাসা।  
1 ও ০ এর বাইনারি গণনায় নীল-শাদার অনলাইনে ছেলেটি ডুবে গিয়েছিলো মেয়েটির সমুদ্র গভীর চোখে। অকুল পাথার যেন। ডুবন্ত ছেলেটি অস্থির নয়, উদ্বেলিত। আনন্দে। প্রেমে ডুবেছে।  
পথ পরিক্রমায় আজ তারা কাছে এসেছে। মনের কথা বলেছে। ভালোবেসেছে। বাঁধ-ভাঙ্গা ভালোবাসা।  
.

ঘ.

“অনেস্টলি ভালোবাসি তাকে। বিয়ে করবো। ফাইজলামি না। নাজায়েজ পারলে প্রমাণ দে।”   
চামড়া শক্ত করে বলেছিলো ছেলেটি সেদিন। আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম। অবুঝ ভালোবাসা। আবেগের উচ্ছ্বাস। আছড়ে পড়বে প্রকান্ড ঢেউ-সমেত আমার ওপর।  
ক্ষেপে ছিলো। বলেছিলাম মেয়েটার সাথে প্রেম তো আল্লাহ অনুমোদন দেন নাই। প্রমাণ চেয়েছিলো সে।  
প্রমাণ কীসে দেই? শ্বাস নিতে ফুসফুস লাগে, এর প্রমাণ কীভাবে দেই? গাছ বাড়তে পানি লাগে তার প্রমাণ কীসে দেই? যেই আল্লাহ পর্দা ফরজ করেছেন, সেথায় পর্দা ভাঙ্গার নাজায়েজের প্রমাণ কিসে দেই?  
পর্দা কাকে বলে? নারী বোরকা পরবে? এই?  
না-তো! পর্দা তো একই সাথে দৃষ্টিভঙ্গি। জীবনের যাপন পন্থা।  
.  
একটা ছেলে কীভাবে পর্দা করে তাহলে? সে কি বোরকা পরবে? উঁহু। মিলছে না তো! তাহলে আল্লাহ যে ছেলেদের জন্যেও পর্দা ফরজ করে দিয়েছেন, সে কীসের পর্দা?  
দয়ামর রব তাঁর কথাতেই বলছেন,  
.  
‘আর (হে মুহাম্মাদ!) বিশ্বাসী পুরুষদের বলো, তারা যাতে তাদের দৃষ্টি অবনত করে আর তাদের গোপনাঙ্গ সামলে রাখে...” “আর (হে মুহাম্মাদ!) বিশ্বাসী নারীদের বলো, তারা যাতে তাদের দৃষ্টি অবনত করে আর তাদের গোপনাঙ্গ সামলে রাখে...”  
[সূরা নূর, আয়াত ৩০-৩১]  
.  
দৃষ্টি কীভাবে অবনত করি? মেয়েটির সাথে একাকী নির্জনে বসে, ভালোবাসার ডালি খুলে হৃদয়ের কথা বলে কীভাবে দৃষ্টি অবনত করি? কীভাবে তার অপরূপ যৌবন অবলোকন না করে বলি ‘ভালোবাসি’? কীভাবে দৃষ্টি নামিয়ে বলি ‘এসো মেলি আজ ডানা, দূর অজানায়’?  
পারা যায় না তো! দৃষ্টি অবনত করতে বলেছেন দয়াময় আর-রাহমান। পরনারীদের দেখলেই অকারণে তাকিয়ে থাকবে না। নারীদেরও বলেছেন একই কথা, পরপুরুষের দিকে অপ্রয়োজনে তাকাবে না। কী করে হারাই একে অন্যের মাঝে এমতাবস্থায়?  
.  
ইশ্! কথাগুলো সেদিন ছেলেটাকে বলতে পারি নি বলে আফসোস হচ্ছে। ছেলেটা প্রমাণ চেয়েছিলো। এখন মনে মনে ভাবছি এইভাবে বললে ভালো হতো।  
“অ্যাই ছেলে। বলো, বলো আমাকে তুমি পারবে আল্লাহর আদেশ মেনে দৃষ্টি নামাতে আবার মেয়েটার সাথে অভিসার করে প্রেমে ডুবতে? ঘুরে বেড়াতে? চোখে চোখ রেখে নীলাঞ্জনার নীলে হারিয়ে যেতে? কীভাবে সমন্বয় করবে বলো?”  
ইশ্!  
.

ঙ.

দয়াময় আর-রাহমান কথা বলছেন,

“ও নবীর স্ত্রীরা! তোমরা আর সব নারীর মত নও। তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় পাও, তাহলে পুরুষদের সাথে কথা বলার সময় কোমল সুরে বলবে না। কারো যদি অন্তরের রোগ থাকে, তাহলে সে লালসায় পড়ে যেতে পারে। তাই সঙ্গত কথা বলবে।” [সূরা আহযাব, আয়াত ৩২]  
.  
“আচ্ছা তুমিই আমাকে বোঝাও। মুসলিম নারীদের পরপুরুষের সাথে কথা বলতে হলে আল্লাহ বলছেন তারা যাতে কোমলতা ত্যাগ করে কথা বলে। দরকারি কথার বাইরে, সঙ্গত কথার বাইরে কোন কথা না বলে। তাহলে কেউ যদি নিজের স্বামী নয়, ভাই নয়, চাচা নয়, বাবা নয়, মামা নয় - এমন কোন একজন পুরুষের সাথে ‘এসো তবে অনুভবে, ভালোবাসার উৎসবে’ বলে ভাবালু হয়, তা কীভাবে সম্ভব হবে? কী হবে এই আয়াতের? কী হবে এই নির্দেশের? কোমলতা ত্যাগ করে এই অসঙ্গত কথা সে বলবে কী করে? এ কি দরকারি কথা? এ কি সঙ্গত কথা?”  
ইশ্! বলতে পারতাম কথাগুলো।  
.

চ.

“আমরা কেউ কারো হাতও ধরি না। কসম আল্লাহ্র!”

কথাটা আজো কানে বাজে। সত্যি? এমনও হয়? এও বুঝি প্রেম?  
নাহ, তাকে ডেকে আসলেই ধীরে ধীরে বলা উচিত ছিল। আমিই বোকা। এখনও। গুছিয়ে বলতে পারি না। বিকেলের অপূর্ব সুন্দর তুলো-মেঘ দেখে নিজে নিজে আর্গুমেন্ট জেতার চেষ্টা করলাম। দয়াময়-এর শেষ নবি ﷺ বলেছিলেন,

“কোন ছেলে কোন মেয়ের সাথে একাকী হবে না।”  
[সহিহ মুসলিম]

নবি ﷺ আদেশ করেছেন। একদম। ছেলে-মেয়ের একাকী অবস্থান নিষিদ্ধ করেছেন।

“শেষ নবি ﷺ কীভাবে নিষেধ করে দিলেন, দেখেছো? বলো ভাই, কীভাবে তুমি প্রেয়সীর হাত না ধরে একাকী পাশে বসে রবে? আচ্ছা ধরেই নিলাম হাত ধরো নি। তাতেও কি রবকে ফাঁকি দেয়া গেল?”  
নবি ﷺ তো এই কড়া নিষেধাজ্ঞার কারণও বলেছেন! জানো কি? নবি ﷺ বলেছিলেন,

“ছেলে-মেয়ে একাকী হলে সেখানে তৃতীয়জন হয় শয়তান!” [সুনান তিরমিদি]

“বলো বন্ধুবর! কীভাবে হবে তার সনে গোপন অভিসার?” মনে মনে গড়ে তোলা আর্গুমেন্টে খারাপ যাচ্ছে না ভেবে এক চিলতে হাসি ঝুলছে। আফসোসের সমাহারে। বলতে পারি নি তাকে। কিছুই না।  
বললে কি সে মেনে নিত?  
কে জানে!  
.

ছ.

যিনা কী?  
অবৈধ যৌন সঙ্গম।  
শুধু কি তাই? নবি ﷺ যে হাতের যিনা, চোখের যিনা, কানের যিনা, পায়ের যিনা, জিহ্বার যিনার কথা বললেন?  
যিনা তো যিনাই। অপরাধ। ভয়ানক। আমরা পাপিষ্ঠ মানুষগুলো এসবের অর্থ ঠিকই বুঝি এ যিনা কেমন যিনা। চোখের যিনা কী, জিহ্বার যিনা কী - ভালোই বোঝে বদমাশ দিল্।  
দয়াময় বলছেন,

“তোমরা যিনার ধারেকাছেও যেও না”  
[সূরাহ ইসরা, আয়াত ৩২]

ধারেকাছেও? ধারেকাছে যাওয়াও তবে হারাম? দয়াময় তো তা-ই বলছেন!  
তবে কি প্রেয়সীর মিষ্টি হাসিতে মনের মৃত সাগরে সাইক্লোন হবে, ভাসিয়ে নেবে সব বাস্তবতার পঙ্কিলতা - তা-ও হবে না?  
.  
নিজেকেই প্রশ্ন করি। নিজেকেই জবাব দিই। কী যেন বলেছিলো ছেলেটি? ওহ হ্যাঁ। “আমরা তো আর শুয়ে পড়ছি না বেকুব পারভার্ট কোথাকার!” আরে! আমি এটাও বলতে পারলাম না? দয়াময় তো কেবল শুতে গেলেই আগুনে দেবেন, তা তো বলেন নি! তিনি তো শোয়া-শোয়ির পথে যত পিচ ঢালা পথ আছে, তাতে ব্যারিকেড দিতে বলেছেন! যিনার ধারেকাছেও যেও না! ধারেকাছেও না! যা তোমাকে যিনায় নিয়ে যায়, যে পথ তোমায় যিনায় নিয়ে থামায়, সে পথের তুমি আশপাশেও যাবে না।  
.  
কন্ট্রোল থাকে? থাকুক! যায় আসে না তো! কন্ট্রোল করতে পারলে যেও – এমন তো বলেন নি দয়াময়! তিনি তো চোখ-মুখ বন্ধ করে রাস্তা থেকেই সরে আসতে বললেন।  
যিনার ধারেকাছেও যেও না। ধারেকাছেও!  
এভাবে বোঝালে কি মেনে নিত না?  
হয়তো।  
.

জ.

দয়াময় বলছেন,

“ও তোমরা যারা বিশ্বাস করেছো! শয়তানের পদচিহ্ন অনুসরণ করো না।”  
[সূরা আন-নূর, আয়াত ২১]

শয়তানকে ফলো একদমই করলাম না। নো, নেভার। ভালো।

কিন্তু তার পদচিহ্ন?  
ছোট ছোট কাজ, ছোট ছোট ভুল টেনে নিয়ে যায় প্রকান্ড আফসোসের চূড়ায়। একদিন।  
এইতো শয়তানের পদচিহ্ন। আপাতঃ নিরীহ। ‘কোন সমস্যা নাই’-কাজ। সেটাই এড়িয়ে যাবো।  
.  
নীলাঞ্জনার নীলে ডুবে গেছি? গেলাম। তবে সাঁতরে কুলে ফিরবো। শয়তানের পদচিহ্ন কী করে অনুসরণ করি? স্পষ্ট আয়াতের পরেও? এতটা মুনাফিক হওয়া যায়?  
ছেলেটাকে খুঁজে বের করি। বলি। মন থেকে।  
অন্তর থেকে যে কথা বের হবে, সে কথা তো অন্তরেই প্রবেশ করবে।  
তাই তো!  
.

পরিশিষ্টঃ  
তাহলে উপায়?  
আল্লাহ্র রাসূল ﷺ বলেছেন,

“দু’জন দু’জনকে ভালোবাসলে, তাদের জন্য বিয়ের মত কোন ভালো কিছুই আমি দেখি না।”  
[সুনান ইবন মাজাহ]  
.  
বন্ধন। সত্যিকারের। যে বন্ধনে দয়াময়ের তুষ্টি, তাতেই তো অন্তরের পুষ্টি!